নারী স্বাধীনতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও বাংলায় উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে উপন্যাসের বিষয়ই প্রাধান্য পায়। কোন শ্রেণি উপন্যাসের বিষয, উপন্যাসে যৌনমাত্রা কতখানি, বাইরের ঘটনা ও বাস্তব উপন্যাসে কেমন এসেছে, অবসাদে—মানসিক বিপর্যয়ে একটি মানুষ কেমন হল, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দল কীভাবে সব গ্রাস করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি এসব উপন্যাসের বিষয়, ভাবা হয়। বিষয় কিন্তু কনটেন্ট নয়, বলা যায় মেটিরিয়াল। অথচ এগুলি কোনোটাই উপন্যাস হয় না, যদি না এসব একটি বীক্ষায় বা ভিসনে উপন্যাসায়িত হয়— উপন্যাস একটি ফর্ম বা রূপবন্ধন। ওই রূপবন্ধনই নানা বিষয়কে উপন্যাস করে তোলে। রূপবন্ধন কথাটির মধ্যেই থাকা আধার ও আধেয় সম্পর্ক। কেউ যদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উপন্যাস রূপ নির্মাণ করতে চায়, তাহলে ওই সন্ত্রাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেই হয় না, চরিত্র পাত্র গল্প বললেই হয় না, কোন বীক্ষা থেকে উপন্যাস এদের একটি আধারে অনান্য রূপবন্ধনে নির্মাণ করেছেন সেটিও দেখতে হয়। বাইরের জীবনের প্রগতি-প্রতিক্রিয়া, ঘটনা উপন্যাসে আসে ওই বীক্ষার সূত্রে অন্য বাস্তবে— বলা যায়, শিল্পের বাস্তবে। সেজন্যই উপন্যাসের গায়ে কোনো 'বাদী' তকমা আঁটা যায় না। কোন ঔপন্যাসিক উচ্চবর্গীয়দের নিয়ে লিখলেন বা নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে, সেটা একদিক থেকে উপন্যাসের সামাজতত্ত্বর বিচার প্রাসঙ্গিক হতে পারে কিন্তু উপন্যাসের যথার্থ অনুধাবনে নয়, আসলে কোন বীক্ষায়, বড়ো লেখকদের ক্ষেত্রে কোন তত্ত্ববিশ্বে ওই মানুষেরা, তাদের জীবন উপন্যাসে ধরা পড়ছে সেটাই বড়ো কথা। বিষয় ওই বীক্ষায় রূপান্তরিত হয়। মানুষ তাদের সীমা অতিক্রম করে।

একারণেই নারীবাদী উপন্যাস বলে কিছু হয় না— নারীর অধিকার নিয়ে প্রবল উপন্যাসও উপন্যাস হিসাবে অপাঠ্য হতে পারে, যেমন চাষি-শ্রমিকদের নিয়ে উপন্যাস। শুধু এইটুকু বোঝা যায় একজন মানুষ নারীর অধিকারের পক্ষে। উপন্যাসকে পড়তে হবে উপন্যাস হিসাবে— উপন্যাসের প্রগতি ওই শিল্পের যাথার্থে বুঝতে হয়। নারীর ভয়ংকর স্বাধীনতার কথা বলেও যে উপন্যাস শেষ পর্যন্ত নারীর পরাধীনতা ও বিকারের দৃষ্টান্ত হয় তার দৃষ্টান্ত তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। ওই বীক্ষা, ওই দেখবার দৃষ্টিকোণ বড়ো কথা আর বড়ো কথা বাখতিন যাকে বলেন (ক্রনোটপের) বোধ। স্পেস ও টাইমের যুগপৎ চেতনা ওই চেতনা ঔপন্যাসিকের বীক্ষারই অন্তর্ভুক্ত— উপন্যাসের নারী ওই বীক্ষাজাত শিল্পবাস্তবের নারী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীক্ষা ১৯২৮-১৯৪৪ অবধি, বলা যায় ১৯৪২ অবধি যে ভূমিতে দাঁড়িয়েছিল তারপর বারো বছর সেই ভূমিতে নতুন বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীক্ষা নতুন করে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। যে কোনো বড়ো শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। এক জায়গায় অনড় হয়ে থাকে না। আমরা প্রধানত উপনাসের কথাই বলছি। তাঁর উপন্যাসের নারীরা এসেছে নানাভাবে— ওই বীক্ষার সূত্রে। ১৯৩৫-৩৬ এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি উপন্যাস লেখেন, তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কুসুম, মতি, সুপ্রিয়া, আনন্দ, কপিলা, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গীয় জীবনের নারীরা তাঁর উপন্যাসে আসে। এ সময়ে মানিকের বীক্ষায় বহির্বাস্তবে সেই সময়ের যে রাজনৈতিক তথা সামাজিক আলোড়ন তার প্রত্যক্ষ কোনো ছাপ নেই। এসব উপন্যাসে বাস্তব ওই উপরিতলের আলোড়ন থেকে আসেনি, এসেছে আরও গভীর তল থেকে আরও মূল প্রশ্ন থেকে। এ সময়ের তাঁর উপন্যাসের নারীরা ওই বহির্বাস্তবের আলোড়নের কোনো চিহ্ন বহন করে না।

ঐতিহাসিকরা ১৯২০ -র দশক থেকেই নারীদের; বাংলাদেশের নারীদের বাইরের জগতে ভুমিকার কথা বলেছেন। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে বর্জনের শপথ মেয়েরা গ্রহণ করেছে। গৃহে কোন কাপড় পরা হবে তা যেহেতু মেয়েরাই স্তির করত। সেহেতু এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গুরুতর। বিদেশি বস্ত্রের দোকানে তারা পিকেটিং করছে। ধর্মঘটে শ্রমিক মেয়েরা সামিল হচ্ছে। আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে আসছে। তনিকা সরকার দেখাচ্ছেন মেদিনীপুরের মতো জায়গায় অত্যাচার তীব্র হলে, Women become mere oningly inportant as fully policized and active members, in the movement। আন্দোলনে পুরুষদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করা হলে মেয়েদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৩৫-৩৬ এর উপন্যাসাবলিতে এসবের কোনো অভিঘাতই নেই। অথচ কুসুম বা আনন্দর মধ্যে নারীর এক স্বতন্ত্র সত্তার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়। মানিক বন্দ্যোপাধায়ের মেয়েদের এইসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? না কি তাঁর বীক্ষায় মনে হয়েছিল এই তাৎক্ষণিক তরঙ্গ মূল কাঠামোয় কোনো আঘাত হানছে না, মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না। ঐতিহাসিকও মনে করেন মেয়েদের এই বাইরের জনজীবনে বেরিয়ে আসা, এমনকী রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদেরও সাহসী রাজনৈতিক কাজে এগিয়ে আসা 'did not lead to major upheaval within the domestic family structure' অনেক সময় পরিবারই milieu-এর পরিবর্তন ছাড়াই ঘটেছিল। এ ধরনের পরিবর্তনের দাবিও কোথাও তোলা হয়নি। মেয়েরা তাদের পরম্পরাগত সক্রিয়তার পরিণতি হিসাবেই দেখেছিল। এ যেন ধর্মীয় আত্মোৎসর্গের মতো। অথচ পরিবারের একটা পরিবর্তন এই সময় থেকে দেখা যাচ্ছে। আগে পরিবারের উৎপাদন ক্রিয়ায় মেয়েদের ভূমিকা ছিল— এখনও দূর গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ওই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে, বিশেষ উৎপাদনে ক্ষমতা না থাকলে মেয়েকে পাত্রপক্ষ পছন্দ করে না। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে মেয়েদের এই উৎপাদনমুখী ভূমিকা আর থাকে না— বিপণনে, বিপণিতেই ওই সব জিনিস লভ্য হয়ে ওঠে। ফলে পরিবারে মেয়েদের ভূমিকা সন্তানপালন, ঘর-গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়। ১৯২০-৩০ এর রাজনৈতিক আন্দোলন এর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীরা ওই পরিবারের পরিধির মধ্যেই থাকে— হয়তো দু-একটি ব্যাতিক্রম আছে, যেমন

স্বাধীনতার স্বাদ-এর মণিমালা। মণিমালার নতুন চেতনায় দাঁড়ানো বাইরের রাজনীতির আবহতেই ঘটেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বীক্ষায় বলেছিলেন নারীস্বাধীনতা, নারীর অধিকারের প্রশ্নটি এখানে ওই পরিবারের সংলগ্নতাতেই ভাবতে হবে। পশ্চিমের মানদণ্ড বা দৃষ্টান্ত এখানে অচল।

অবশ্য পরিবারের বাইরে নারীর নিজ অস্তিত্ব বা সত্তার কথা যে তিনি একদম বলেন নি, তা নয়। দিবারাত্রির কাব্য-তে আনন্দ তার প্রেমের আগুনে ওই পরিবারের পরিধির বাইরেই এক বিশ্ব নাচের কেন্দ্রে, এক আগুনের মধ্যে। মালতী - অনাথের গল্পও পরিবার, এই ধারণাকে ভেঙেই। কিন্তু মানিক আগুনের বলয়ে নগ্ন আনন্দের মৃত্যুতে যেমন এক স্বাধীন উদ্ভাস দেখান, তেমনি ওই উদ্ভাসের বাস্তব যে নেই সেটাও। একটি পরবর্তীকলের গল্পে তিনি দেখিয়েছিলেন, একটি পরিবারের স্বার্থগত টানাটানির মাঝখানে কেমন পাড়ার অন্য নারীরা এগিয়ে এসে একটা কমিউনের আদর্শ তৈরি করে। মানিক তখন তাঁর বীক্ষায় এই পরিবারের বিকল্প হয়তো এরকম একটি ব্যবস্থাতেই দেখতে পাচ্ছিলেন। এর পূর্বাভাস অবশ্যই আছে ১৯৪০-৪১ এ প্রকাশিত তাঁর একটি উপন্যাসে। এ উপন্যাসটি নানাদিক থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ১৯৩৫ -এর জননী, ১৮৪০-৪১ -এর শহরতলী ও ১৯৫১-৫২ -র সোনার চেয়ে দামি— এই তিনটি উপন্যাসের সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারীদের একটু চিনতে চাই।

১৯৩৫-এ প্রকাশিত জননী শ্যামার গল্প— এ গল্প পড়বার সময় মনে রাখতে হয় ওই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। পাঠকের বিবেচনায় মূলত সেগুলি পুরুষের গল্প— শশী, হেরম্ব, কুবের বা হোসেন মিয়ার। নারীরা ওই পুরুষদের গল্পের সংগিতের সঙ্গে সঙ্গ— আর যাকে মোটাদাগে বিষয় বলে তা এক নয় উপন্যাসগুলিতে। ঔপন্যাসিগের বীক্ষার বহুমাত্রিক আধারে এরা নির্মিত। এ বীক্ষাকে কেউ বলতে পারেন নিয়তিবাদ, কেউ বলতে পারেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আবার কেউ হোসেন মিয়ার মধ্যে খুঁজে পান সময়ের গভীর স্বর। একরৈখিক কোনো বীক্ষায় মানিক নিজেকে স্থিত করেননি। জননী এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এ এক নারীর গল্প এবং সেই নারী জননী। 'সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল।' গল্পের মূল স্বর 'মা হইল'। পরিবরের বৃত্তের মধ্যে বাইরের যে সব আন্দোলন-আলোড়ন চলছে তা থেকে দূরে ও সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ওয়াকিবহাল না থেকে, শ্যামা 'মা হইল' এই সংবাদটি জরুরি, আরও জরুরি লেখকের আর একটি সংবাদ 'জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।' এই মানবী শ্যামা একান্তভাবে জননী— বধূজীবনের সাধ বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা নিঃশেষ হওয়ার সময় শ্যামা জননী হয়।

শ্যামার গল্প ঘটনাবহুল ও জটিল। একাধিক পুরুষ তার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে। আবার কোনো পুরুষ তাকে সাহায্যও করেছে। শ্যামা পরিবারের বৃত্তের মধ্যে পুরুষদের মিথ্যাচারণের সঙ্গে লড়াই করেছে— সমগ্র উপন্যাস শ্যামার ওই লড়াইয়ের গল্প। লক্ষণীয়, কোনো পুরুষকেই—শীতল, রাখাল, মামা কাউকে সে ত্যাগ করেনি। যেহেতু শ্যামার কোনো আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না সেহেতু তাকে পুরুষদের কাজে লাগাতে হয়। শ্যামা পরাধীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান এই পরাধীনতার মধ্যে জননীত্বই শ্যামার একমাত্র স্বাধীন পরিসর। আর জনন থেকে জননী: শ্যামা সন্তান সৃষ্টির মধ্যেই তার স্বাধীন পরিসর খুঁজে পায়। সন্তানপ্রসবই শ্যামার মহামুক্তি। শ্যামা স্বাধীনতার স্বাদ পায় গর্ভধারণে, সন্তানপ্রসবে। মানিক তাঁর বীক্ষায় এভাবেই জননীকে পুরুষপ্রধান সমাজ ও পরিবারের স্বাধীন পরিসরে দেখেন। রাজনৈতিক আন্দোলন এই মূল পৌঁছাতে পারেনি, এ পরিসরকে মানিক তাঁর বাস্তববাদে বোঝেন।

বস্তুত নারীস্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে পশ্চিমে গত দুশো বছর ধরে লেখালেখি, ভাবনাচিন্তা হয়েছে— নারীও এই বিতর্কে, ভাবনায় বড়ো অংশ নিয়েছে। বেন্ডার চিন্তা, ফেমিনিনিজম নানাভাবে এসেছে। কিন্তু পশ্চিম আজও হদিশ পায়নি—সম্প্রতি ইংলন্ডের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বাইরের চাকরি নয়, পারিবারিক জীবনের দায়দায়িত্বর গুরুত্বই ক্রমশ মেয়েরা বেশি করে স্বীকার করছে। নারীর জননীত্বকে পশ্চিমের নারীবাদীরা উপেক্ষা করতে চেয়েছে কিন্তু ওই জননীতত্ত্বের জন্য মেয়েরা আজও উৎসুক, মাতৃত্ব তো যৌনক্রিয়ার ফল। মাতৃত্বর মধ্যেই থেকে যায় নারীর যৌন অধিকার ও স্বাধীনতা। আর উৎপাদন ক্রিয়া ও সম্পর্কের দিক থেকে মাতৃত্ব নারীর ভূমিকাকে স্পষ্ট করে— পুরুষতন্ত্র, পুরুষকর্তৃত্ব এখানে তার হেগিমনি হারায়। নারীর শরীরকে পুরুষ জোর করে অধিকার করলেও ওই মাতৃত্বে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। নিজ শরীর থেকে উৎপাদিত সন্তান নারীর স্বাধীনতার পতাকাবাহী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জননীর গল্পে পুরুষের মিথ্যাচারের, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার, নারী সম্পর্কে নির্মম ঔদাসীনের কথা বলেছেন; এর প্রতিপক্ষে একান্ত জননীত্বের প্রতিরোধকে দেখান। ওই জননী তার নিজ সীমাও অতিক্রম করে মাতৃত্বে।

গল্পটি এই নয় যে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি চর্চিত পুরুষতন্ত্রে, নারীর সব সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের উত্তরাধিকারীর গর্ভাধানই নারীর একমাত্র কাজ এটা বলা। এখানে শ্যামার জননীর অস্তিত্বে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে, তার সন্তানদের মধ্যে বাঁচে, আগলে রাখে তার জননীর সত্তাকে। নিজ পুত্রবধূ সম্পর্কে শ্যামার যে বদ্ধ মনোভাব, সাধারণ মায়ের পুত্র সম্পর্কে অতিরিক্ত স্নেহ-উদ্‌বেগ, বউমা নির্বাচনে পুত্রর সিদ্ধান্তে তার যে আপত্তি, তাও দূরে চলে যায় ওই জননীত্বর পূর্ণ জাগরণে। ছেলে বিধানের জন্য পছন্দ ছিল শ্যামার কোমল, ক্ষীণ, ভীরু একটি মেয়ের। জননীর আশ্রয়ে সে বাঁচবে, কিন্তু বিধান পুরুষ সে চেয়েছে উদ্ধত অগ্নিময় নারীর। ধিনের বউ উদ্ধত নয়, কিন্তু শ্যামা তার শরীরকে ভয় পায়। জননীর এ এক অদ্ভুত দোটানা। কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারে পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা তখনই সব দোটানা শেষ। জীবনের এক প্রান্তে আসা, শ্যামার তো আর সন্তানসম্ভাবনা, তার স্বাধীন পরিসর নেই তাই তার পুত্রবধূকে 'সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা বাঁচিয়া রহিল।' জননীত্বর এই ইতিহাসেই নারী তার আকাশ পায়, তার স্বাধীনতা - অধিকারের অন্যসব লড়াই এই পরিসরে

মিললেই নারী সার্বিকভবেই এক মুক্ত আকাশে পাখা মেলে দেয় : 'ঘরে রহিল কাঠ কয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁকা দিয়া আকাশের কয়েকটি তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।' এই জননীত্ব এক দ্বিবাচনিক সংলাপে ঋদ্ধ—শ্যামা এখানে নিজে জননী নয়। কিন্তু তার কোলে যে শিশু সেই জীবন আর দেয়ালে মায়ের ছায়া। জননী এখানে মুক্তি পায় বিশেষ ব্যক্তির আধার থেকে, নারীর এক একান্ত স্বাধীনতার পরিসরে। ১৯৩৫-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই নারীকে দেখলেন।

১৯৪০-৪১-এ মানিক তাঁর বীক্ষাভূমির এক সন্ধিক্ষণের প্রস্থানে। ওই জননীর রূপ অন্যভাবে তাঁর কাছে এল। শহরতলী ওই বীক্ষাভূমি জাত। এ উপন্যাসের জননী যশোদা 'চাঁদের মা' বলে পরিচিত। চাঁদ নেই, কিন্তু তার মা হবার অভিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ। যশোদার বিবাহিত জীবনের কোনো খবর এ উপন্যাসে নেই। লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ চেহারার যশোদা লাবণ্য ও কোমলতাহীন— চাঁদের বাবা সম্পর্কেও কোনো খবর লেখক দেন না। শোনা যায়, দশ বছর আগে এক বিরাট চেহারার কুস্তিগীর এসেছিল, তারপর সে চলে যায়— এরপর যশোদা আর পুরুষ দেখেনি। শক্তিশালী বিরাট শরীর যশোদাকে এখনও আকর্ষণ করে। চাঁদ মারা যাবার পর যশোদা তীব্র বেদনায় আক্রান্ত হয় কিন্তু তারপর তার চোখে বেদনা, স্বপ্নময় বেদনারও কোনো ছাপ দেখা যায়নি। যশোদা রূপান্তরিত অন্য এক জননীতে—চাঁদের মৃত্যুকে ভোলার জন্যই সে কুলি-মজুর নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে কমিউনের মতো গড়ে তোলে। জননী শ্যামার জননীত্ব তার পরিবারের পরিধির মধ্যেই হয়ে ওঠে, যশোদা তার জননীরূপকে নির্মাণ করে অচেনা মানুষদের নিয়ে, এ কোনো প্রচলিত অর্থে পরিবার নয়। শ্যামা মোটামুটি ভদ্রলোক পরিবারের আর যশোদার বিচারে ভদ্রলোকেরা নাকি বড়ো বেশি ছোটোলোক। কুলিমজুরের ভয়ডর আছে, না-বাবু না -কুলি মজুরদের চক্ষুলজ্জাও নেই, ভয়ডরও নেই।

যশোদা কুলিমজুরদের তৈরি করে একটা অন্য ধরনের পরিবার। তাদের বাড়ি ভাড়া দেয়, তিনটি বড়ো উনুনে তাদের জন্য রান্নাও করে। এ বাড়িতে সেই কর্ত্রী। কুলিমজুরদের খাওয়ানোর দায়িত্বও তার। তারা বেকার থাকলে তাদের কর্মসংস্থানও সে করে। কলকারখানায় আন্দোলন ধর্মঘট হলে সে-ই পরামর্শদাতা। যশোদা শ্যামার জননীত্বকে অঙ্গীকার করে, কিন্তু সে শ্যামা নয়। একটি পুত্র কবে সে হারিয়েছে, পুত্রহারা যশোদা তৈরি করেছে এক নতুন বাস্তব—তার নারীসত্তার স্বাধীন পরিসর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যশোদার এই পরিসরের কর্ত্রী হয়ে ওঠার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেননি। লেখকের প্রত্যয় ও বীক্ষা এমনই স্থির যে ওই ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, জানতেন। যশোদার প্রতিপক্ষ এখানে জননীর মতো শীতল বা রাখাল হয়, প্রতিপক্ষ সত্যপ্রিয়— নানা ব্যবসা ও মিলের মালিক। এরা তো আজও নানারূপে উপস্থিত— সত্যপ্রিয় তার পরিবারের মানুষদেরও শ্রমিকদের মতোই, নির্মম ভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। চতুর, আধুনিক কর্পোরেট-অস্তিত্বর পূর্বসূরি এই শক্তিকে যশোদা চ্যালেঞ্জ জানায়। শহরতলীর-র গল্প বহুমাত্রিক—শহরতলীর কিম্ভূত পরিবর্তন, আজকের ভাষায় বলা যায় 'উন্নতি' এ উপন্যাসে বিশ্লেষিত। এখন যে প্রক্রিয়া প্রবল ও প্রকট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ১৯৪০-এই স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন। সে প্রসঙ্গ আলাদা। এখানে আমাদের বলার কথা যশোদা কোনো শ্রমিক নেত্রী নয়, সে কলকারখানার কর্মীও নয়। অথচ তার বাড়িতে থাকা শ্রমিকরা তাকে অবলম্বন করেই বাঁচে—সে শ্রমিকদের সভাতেও যায়, সব কথা সে বোঝে তা নয়। তার ভূমিকা এক জননীর যেন— বৃহত্তর বাস্তবে এক মা। সে 'পুরুষ দেখিতে পায় না, সকলে তার কাছে শিশু।' শ্যামার একান্ত জননীত্বর সঙ্গে যশোদার জননীত্বর তফাত, সে বাইরের জগতের লড়াইয়ে সে সত্যপ্রিয়র চিত্রকল্পে যে শোষণ অত্যাচার, উচ্ছেদ তার বিরুদ্ধে জননীরূপিনী প্রতিবাদ। সে বকে, ভালোবাসে, তিরস্কার করে আশ্রয় দেয়। আর জননী-তে শ্যামার কোলে নতুন জীবন স্পন্দিত হয়েছে, এখানে তা হয় না। সত্যপ্রিয়র চোখে যশোদা তার বড়ো শরীর নিয়ে এক মারাত্মক ক্ষুধাকে দেখে— এর সঙ্গে গ্রাম থেকে আসা রিট শরীরের ধনঞ্জয়ের মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনা হয় না। ওই ক্ষুধা আসলে সব কিছুকে গ্রাস করতে চায়— যশোদার জননীত্বকেও। যশোদাকে চলে যেতে হয়— শহরতলির উন্নয়নের অজুহাতে তার বাড়ি দরকার— সত্যপ্রিয়র প্রতিশোধ যশোদার প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে। যাবার সময় সে তিনটি বড়ো উনুন ভেঙে দিয়ে যায়— জননী যশোদা নিরুদ্দেশ যাত্রী। এ জননী নতুন কালের—আমাদের বাইরের আন্দোলন পারিবারিক নারীর ভূমিকাহীনতাকে ভাঙতে পারেনি। যশোদার মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেই নতুন ধারণা আনতে চাইলেন— শ্যামা তার গর্ভের সন্তানদের নিয়ে জননী, তাকে বার বার পুরুষের যৌনক্রিয়ার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। যশোদার নিজ পুত্র মারা গেছে, সে কোনো পুরুষের কাছে তার জননীত্বর জন্য যায়নি, শরীরের উৎপাদনকেও আর মানেনি। বৃহৎ শরীরের আধারে তৈরি করেছে পরিবার নিরপেক্ষ, পুরুষ যৌন সম্পর্ক রিপেক্ষ এক জননীকে; এ জননী আজও ভবিষ্যতের, নারীবাদী নানা তর্ক-বিতর্কে এর হদিশ হাওয়া যায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বাবনা ১৯৫১-৫২-র সোনার চেয়ে দামি উপন্যাসে নতুন মাত্রা পেল। ১৯৪০-৪১ এর পরিস্থিতি ১৯৪৭-এর দাক্কায় পালটেছে— স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ত হয়েছে। উপন্যাসটিতে বিভাগজনিত ট্রমা প্রত্যক্ষভাবে নেই। আবার ১৯৪৭-র স্বাধীনতা-মায়ার উদ্দীপনাও অনুপস্থিত। আছে বৃহত্তর, গভীরতর এক ভাঙনের চেতনা আর এই বোধ সঞ্চারিত জীবন তো ধ্বংস হয় না, ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র সাধনার কৌতূহল জীবন যে রূপ নিচ্ছে তাকে বোঝার। মানিকও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষগুলির বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ওই ধ্বংসহীন জীবন ও ধ্বংস হওয়া অবস্থার পটভূমিতে বুঝতে চেয়েছেন। তিনটি মিছিল সামনে : উদ্‌বাস্তদের মিছিল, ছাত্রছাত্রী মিছিল, ধর্মঘটী মজুরের মিছিল। এই মিছিলগুলির পটভূমিতে, কালোবাজার, চোরাকারবারের সমাজের ভাঙনদশায় ও উপন্যাসের নারীর স্বাধিকারের প্রশ্ন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্ন উদ্যত।

এ উপনাসের সাধনা শ্যামা বা যশোদা নয়। তার গলার হার ভেঙে যাওয়া ও গলা খালি হওয়া এবং স্বামী রাখালের বেকারত্ব আর রাখালের বিশুর মায়ের গয়না চুরি, এই সোনার দুটি ঘটনা উপন্যাসের ক্রিয়াকে চালু করে। এই বাস্তব ঘটনার অভিঘাত ছড়ায় বহুদূর—নারী হিসাবে সাধনার নিজ সত্তা ও স্বাধীনতার আবিষ্কার ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। জীবিকাগত, চৈতন্যগত সংকট যে পরিস্থিতি আসছে তাতে সাধনা উলটেপালটে দেখছে নিজেকে, নিজের সঙ্গে রাখালের সম্পর্ককে। ভোলার মা চরিত্র ও গল্প সাধনার এই দেখাকে তীক্ষ্ণমুখ দিয়েছে। রাখালের সঙ্গে সম্পর্ককে দেখতে দেখেতেই সাধনা পৌঁছেছে কলোনির লড়াইয়ে। নিজের ভূমিকাকে সে ওই লড়াইয়ের সংলগ্নতাতেই আবিষ্কার করেছে। আর সাধনার এই নতুন চেতনার ছাপ রাখালের ওপরও পড়ে—রাখালও নিজেকে দেখতে চায় আরও স্পষ্ট করে। সাধনা রাখলকে পালটায়। নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নে মানিক একথাই বলতে চান, পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, তার তন্ত্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নয়, তাকেও পরিবর্তন করেই এ স্বাধীনতা বিজয়ী হয়।

সোনার গয়না বেচা নিয়ে সাধনার উক্তি লক্ষণীয় : 'হারটা তুমি বেচেছিলে তুমি? গয়না আমার, তুমি বেচবে কি রকম? আমরা গয়নাও মালিক নাকি তুমি যে ওরকম প্রতিজ্ঞা কর? সেবারও আমার গয়না আমি বেচেছিলাম, এবারও আমিই বেচব।...সংসার চালাবার দরকার তোমার যেমন আমারও তেমনি।' সোনার চেয়েও দামি এই স্বাধীন আমিত্ববোধ—সংসার চলাবার দায় কেবল পুরুষের নয়, নারীরও। সাধনার কোনো উপার্জন নেই, রাখালও বেকার : এ স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ মতবিরোধ দ্বন্দ্ব নয়। স্বামী-স্ত্রীর সামগ্রিক ভূমিকা নিয়েই এখানে মৌল প্রশ্ন উঠেছে।

ওই সোনার গয়নার ঘটনা ফাঁকা জমিতে হোগলার খেলাঘরগুলিতে বাস করা ভোলার মার জীবনেও ঘটে। সাধনার স্বাধীনতাবোধ নতুন জমি পায় ভোলার মায়ের জীবন প্রত্যক্ষ করে : ঘরের এত কাছে এই জীবন যে সে আগে জানত না, সামান্যতম উপকরণে বাঁচা এই জগৎ তাকে মুগ্ধ করে। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচার এই লড়াই সাধনার স্বাধীন পরিসরকে নিয়ে বানাকে দুলিয়ে দেয়। তবু বেকারত্বের জালে বন্দি রাখালের সঙ্গে তার সংঘাত মেটে না। রোজগার করলেই তো মেয়েরা স্বাধীন হয় না—রাখাল বলে তাহলে তো পুরুষও স্বাধীন হত, তারা তো স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা অনেক বড়ো জিনিস। নারী আন্দোলন দেশের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দেয়, কিন্তু শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নারী আন্দোলন সস্তা শখ। মেয়েরা যাতে বড়ো আন্দোলনে যোগ না দেয়, তার জন্য তাদের স্বার্থ ভিন্ন করে দেওয়া। 'পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেচে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র, নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।' পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, মেয়েদের লড়াই অবস্থা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। পুরোনো জীবন ভেঙে যাচ্ছে— এই ভাঙনের পটভূমিতে সাধনা। প্রভা নামক মেয়েটি তার চিন্তাকে উসকে দেয়। তাদের সংকটের মোকাবেলায় সাধনা নিজ ভূমিকা নিক, পুরুষ রাখাল এটাই মানতে চায় না। সাধনার সূত্রে তার চাকরি হোক এটাও চায় না। সাধনাও বার বার নিজেকে বলতে চেয়েছে, আত্মসমালোচনা করেছে। সাধনা স্বাধীন হচ্ছে— রাখালকে নিয়ে, ভোলার মায়ের লড়াইয়ে রাখালের সঙ্গে ভিন্নমুখী হয়ে সে ওই স্বাধীনতা এক প্রকৃত লড়াইয়ে স্থাপন করে। রাখাল যখন অনেক টাকা, সাধনার গয়নার নেশায় মশগুল, তার টাকায় স্ত্রী-ছেলেকে আদরে রাখার স্বপ্নে বিভোর, তখন সাধনা অন্য বৃত্তে। রাখালের বেকারত্ব শেষ হলেও সাধনা রাখালের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক পূর্ববৎ হতে পারছে না। স্ত্রীকে সুখে রাখা ভালোবাসার প্রচলিত পুরুষ-শাসিত সমাজের ধারণাতেই আটকে থাকে রাখাল। স্বাধীন নারীকে গ্রহণ করার আধার হয়ে উঠতে পারে। ভোলার মায়েদের লড়াইয়ে সাধনা আপোষহীন, রাখাল আপোষপন্থী। সাধনার স্বাধীন হয়ে ওঠা এই রাখাল নামক মধ্যবিত্ত পুরুষের কাছে সমস্যা অথচ সাধনা যে চাকরি করে, তার জন্য তাকে উপেক্ষা করে তা নয়। সাধনা বলে, টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড়ো হোক, এই স্বার্থ বড়ো স্ত্রী কাছে। রাখাল ভাবে তার মদ খাওয়ার কথা বলে সাধনা, আসলে সে চায় স্বামী অর্থ-নাম-যশ নয়, দশজনের নিজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার স্বাধীনতায় সাধনা নতুন নারী— মধ্যবিত্ত নারীর মুক্তির পথ এটাই। রাখালকেও সে এপথেই মুক্তি পেতে বলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই ১৯৩৫, ১৯৪০-৪১, ১৯৫১-৫২-য় নারীর নিজ ভূমিকা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বীক্ষাকে নির্মাণ করেন— যেন গল্পের মোড়কে এক সন্দর্ভই গড়ে তোলেন। শ্যামা-যশোদা-সাধনা, এই তিন থাকে মানিক ধরে দেন তাঁর বীক্ষার ক্রমিক প্রক্রিয়াকে। প্রচলিত নারীবাদ নয়, পশ্চিম প্ররোচিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারী স্বাধীনতা নয়, যৌনমুক্তির একপেশে শ্লোগান নয়, এখানকার কথা বলেন—এতে জড়িয়ে থাকে নারীর শরীর, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি। ১৯৩৫-এর শ্যামা আর ১৯৫১-৫২-র সাধনা দুই সময়ের প্রতিনিধি— চল্লিশের দশকের অভিজ্ঞতায় মানিক দেখেন সব ভাঙছে, শ্যামা ওভাবে থাকতে পারে না, নতুন জীবনের স্পর্শ দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশবিভাগে বিপর্যস্ত যশোদার কল্পস্বর্গে লড়াইও স্বাধীনতার স্বাদে নেই, তাই সাধনার জটিল লড়াই, স্বাধীনতার নতুন পতাকা। পারিবারিক জীবনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সংঘাত ও বুনোনে এ নারী পালটাতে চায় নিজেকে স্বামী-পুরুষকে এবং সমগ্রভাবে সমাজকে, পরিবেশকে—এই সাধনাই নারী স্বাধীনতা।

আলোচনাটির জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : বাস্তববাদের বহুমুখ বইটির ও শরহতলী (কোরক ১৪১৪ বইমেলা সংখ্যা) প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হছেয়ে।